প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

পথ হারানো শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

শি ক্ষা

আমিরুল আলম খান

বাংলাদেশে শিক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিকর। এবং তা এতই হতাশাজনক যে শিক্ষার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বড় অন্তরায়ও। ১৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক *বণিক বার্তার* একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'অবকাঠামো উন্নয়নে সবচেয়ে অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা খাত'। এটা নিরেট সত্য। ব্যানবেইসের বরাতে বলা হয়েছে, অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মূলধন বিনিয়োগ মাত্র ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ। আর সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষায়, ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ। দেশে মোট ৫৬ হাজার (কয়েক দিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর বরাতে বলা হয়েছিল ৬৫ হাজার!) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়নে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫১২ কোটি টাকা। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ওই একই বছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের ৯০ শতাংশই ব্যয় হয়েছে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ।

আমরা হিসাবটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। ৫৬ হাজার স্কুলের প্রায় ৪ লাখ শিক্ষকের বেতন-ভাতা বাবদ যে ব্যয়, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ, তা কি সত্যিই অন্যায্য? যদি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার সঙ্গে কেন আরও ১০ হাজার কোটি না হোক অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকা অবকাঠামো ও শিক্ষা সহায়ক খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয় না, সেটা একটা যৌক্তিক প্রশ্ন হতে পারত। বাংলাদেশে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন খাতে ৫-১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কি খুব অন্যায্য দাবি?

একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় অবকাঠামো ব্যয় ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। কিন্তু জানা জরুরি ছিল, উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে ব্যয় কত শতাংশ। সেটি নিয়ে এ দেশে কারও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার উন্নয়নে অবকাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষায় তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই উত্তম পাঠ্যপুস্তক ও উত্তম শিক্ষক। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে এ দুটি বিষয়ই সবচেয়ে উপেক্ষিত।

সম্প্রতি যশোরে এমপিওভুক্তির দাবি করে বিক্ষোভরত মাধ্যমিক ও কলেজশিক্ষকদের একটি অংশ শিক্ষামন্ত্রীর সামনে শুয়ে পড়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করেছেন। আর তিনি নয় বছর ধরে যে অমৃতবাণী শুনিয়ে আসছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে অর্থমন্ত্রীর কাঁধে দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন। তার আগে খুলনায় কোচিং করার জন্য এককভাবে শিক্ষকদের দায়ী করে শিক্ষামন্ত্রী ও দুজন সচিব কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

প্রাথমিক স্তরের মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনায় আমাদের অবহেলা, অযোগ্যতা সীমাহীন। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের ভাড়া করে আমরা শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছি। তাতে না প্রাধান্য পায় শিশুর বয়স, রুচি, সামর্থ্য; না তাদের জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু, ভাষা ও উপস্থাপনের কৌশল। দেশে সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সৃজনশীল পাঠ্যবই লেখা যায়নি। কেননা, সৃজনশীল পাঠ্যবই সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোনো ধারণাই নেই! কথাটি তিক্ত, তবে নিরেট সত্য। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নকে রাতারাতি সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের তকমা লাগিয়ে কর্তারা ভেবেছেন, দেশে সৃজনশীল শিক্ষার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মৌল উপাদান ভাষা, গণিত, স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও পরিবেশ। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে শিশুদের প্রাথমিক স্তরে সবজান্তা পণ্ডিত বানানোর কসরতে শিশুরা শিক্ষার আনন্দ থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি পড়ার চাপে মনোবৈকল্যের শিকার হচ্ছে। বইয়ের বোঝা পিঠে নিয়ে বইবার সামর্থ্য পর্যন্ত শিশুদের নেই, বইয়ের বোঝা এত বেশি যে ৯০ শতাংশ শিশুর মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে! কিন্তু শিক্ষার উন্নয়নে তেজি ঘোড়ায় টানা রথ থামছে না।

> সৃজনশীল পাঠ্যবই সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোনো ধারণাই নেই! কথাটি তিক্ত, তবে নিরেট সত্য

প্রথম আলোয় সোহরাব হাসান 'শিক্ষার এই দুর্গতি ঠেকাবে কে' শিরোনামে একজন অভিভাবকের বরাতে ভয়াবহ তথ্য জাতির সামনে হাজির করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর বাবা দুঃখ করে বলেছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এবং দীর্ঘদিন সাহিত্যচর্চা করেও তাঁর সন্তানের বাংলা বইয়ে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারেননি। তিনি বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষককে দেখালে তিনিও অপারগতা প্রকাশ করেছেন।' সোহরাব হাসান প্রশ্ন তুলেছেন, 'তাহলে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে?' শিক্ষামন্ত্রী কোচিং-বাণিজ্য বন্ধের যে হুংকার ছাড়েন, তা যে কত অসার, তা বলতে গিয়ে এই কলামে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'কেন শিক্ষার্থীরা কোচিং করে, সেই প্রশ্নের জবাব ওই অভিভাবকের ক্ষুব্ধ মন্তব্যের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়।' (*প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৭)।

কিন্তু সে কথা আমাদের শিক্ষা-বাণিজ্যের ইজারাভোগীরা মানবেন কেন? দেশি-বিদেশি পরামর্শক আর বিদ্যা-বাণিজ্যের বণিকেরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিয়ে যে খেলায় মেতেছেন, তার অবসান হওয়া জরুরি। আর সে জন্য প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বণিক পণ্ডিতদের প্রথমেই বিদায় করতে হবে। অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রশ্নটির চেয়ে এই পণ্ডিতদের অত্যাচার থেকে আমাদের শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া বেশি জরুরি। কিন্তু যে সচেতন তরুণসমাজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত, তাদের ওপর এখন চলছে অত্যাচারের এমন এক স্টিমরোলার যে তাদের পাঁচজন মিলে কোথাও একটি সভা করার অধিকার 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে' অস্বীকৃত। বাংলাদেশে যেন কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব না ঘটে, তার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষার এই দুর্গতি ঠেকাতে এ দেশের তরুণসমাজকেই অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু গোটা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন মুলতবি রেখে নেতৃত্বদানকারী প্রজন্ম গড়ে তোলা কখনোই সম্ভব নয়।

পরিহাস এই যে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও বাতাস দূষিত করার অপকৌশল চলছে। সেখানে নাকি নির্বাচিত 'ছাত্র সংসদ' আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি নির্মাণে হাতেখড়ি নিচ্ছে। প্রাচীন প্রবচনটি স্মরণ করে শেষ করা ভালো, 'বানরে সংগীত গায়, শিলা ভাসে জলে/ দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'

● **আমিরুল আলম খান : শিক্ষাবিদ।**
amirulkhan7@gmail.com